মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় ইতিহাসের উপাদান

আবদুল করিম

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কবি মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় যে ইতিহাসের উপাদান রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। তাঁর রচিত মক্তুল হোসাইন কাব্যে (রচনা ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দ) বংশ-লতিকাখানি পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা ভাষাবিদরা এর ঐতিহাসিক তথ্যের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টার ত্রুটি করেননি, কিন্তু তবুও তার যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারিত হয়েছে বলে মনে হয় না। 'বাংলা দেশে মুসলমান আগমনের প্রাথমিক যুগ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখার সময় আমি আধুনিক গবেষকদের কয়েকটি মতামতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করি, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিধায় ঐ প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় বিরত থাকি। ঐ সূত্রগুলির উপর বিশদ আলোচনা করা ও সামগ্রিক ভাবে মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকার ঐতিহাসিকতা যাচাই করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় অধ্যাপক আহমদ শরীফ মক্তুল হোসাইন কাব্য থেকে মোহাম্মদ খানের মাতৃকুল ও পিতৃকুল পরিচিতির উভয় অংশই সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু মাতৃকুল পরিচয়ের সম্পাদনায় কিছু ভুল ত্রুটি ধরা পড়ায় পরে সাহিত্য পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় তিনি তার পাঠ সংশোধন করেন। বর্তমান আলোচনায় সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে পিতৃকুল পরিচয় এবং সাহিত্য পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা থেকে সংশোধিত মাতৃকুল পরিচয় অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করার জন্য সম্পূর্ণ বংশ-পরিচয় কবির ভাষায় পুনরুল্লেখ করা হল না। তবে শরীফ সাহেবের সম্পাদিত বংশ-পরিচয় অনুসরণে নিম্নলিখিত বংশ-লতিকা খানি তৈরী করা হয়েছে।

মাতৃকুল পরিচয়

১. শয়খ শরীফ উদ-দীন
২. কাজী আলম
৩. মীর কাজী
৪. খান কাজী
৫. শয়খ হামিদ
৬. বাবা ফরিদ
৭. হামিদ আলম
৮. শাহ নাসির -উদ.দীন
৯. পীর মোকাররম
৯. শাহ আবদুল ওহাব + (সদর -ই- জাহান, শাহ ভিখারী, পীর -ই- মুলুক)
১০. শাহ আহমদ
কন্যা +

পিতৃকুল পরিচয়

১. মাহি আসোয়ার
২. হাতিম
৩. সিদ্দিক
৪. রাস্তি খান (চাটিগ্রাম দেশ পতি)
৫. মিনা খান
৬. গাভূর খান (যার কীর্তি গৌড়দেশ ভরি)
৭. হামজা খান মছলন্দ (ত্রিপুরা ও পাঠান বিজেতা)
৮. নসরত খান (চাটিগ্রাম পতি)
কন্যা + ৯. জালাল খান (চাটিগ্রাম দেশ কান্ত)
১০. বিরহিম খান
১০. মোবারিজ খান
১১. মোহাম্মদ খান (কবি)

শরীফ সাহেবের মতে মোহাম্মদ খানের মাতৃকুলের নবম পুরুষের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সদরজাঁহা, কিন্তু আসলে সদর-ই-জাহান উপাধি ; "সদর জাঁহা করি যার ভুবনে বাখান," অর্থাৎ সদর-ই-জাহান উপাধিতে তিনি ভূষিত ছিলেন, তিনি 'শাহ ভিখারী' ও 'পীর-ই-মুলুক' উপাধিতেও পরিচিত ছিলেন, তাঁর প্রকৃত নাম শাহ আবদুল ওহাব। দ্বিতীয়ত শরীফ সাহেব শাহ আবদুল ওহাব ওরফে সদর-ই-জাহানকে মোহাম্মদ খানের মাতামহ গণ্য করেছেন, কিন্তু শাহ আবদুল ওহাব সম্বন্ধে মোহাম্মদ খান এমন কোন ইঙ্গিত করেন নাই, বরং শাহ আহমদ সম্বন্ধে করেছেন, যেমন, "শাহ আহমদ পীর করম বন্দন,

উদ্ধারহ মাতামহ পশিলুঁ শরণ।" অবশ্য এই মত গ্রহণ করার পক্ষে বাধা আছে, ইহা গ্রহণ করলে বলতে হবে, মোবারিজ খান ফুফাত ভাইএর মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। ফুফাত ভাইএর মেয়ে বিয়ে করা বোধ হয় অনৈসলামিক নয়, কিন্তু সাধারণত এই প্রথা সমাজে চালু নয়। এই জন্যই বোধ হয় শরীফ সাহেব সদর-ই-জাহানকে মোহাম্মদ খানের মাতামহ গণ্য করেছেন। তৃতীয়ত শরীফ সাহেব কবির মাতৃকুলকে পীর পরিবার ও পিতৃকুলকে শাসক পরিবার নির্দেশ করেছেন। কবির বর্ণনায় তাঁর মাতৃকুল যে চট্টগ্রামে আগত বার আউলিয়াদের অন্যতম আউলিয়া শয়খ শরীফ-উদ-দীনের বংশোদ্ভূত, তাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও তাকে সরাসরি পীর পরিবার হিসাবে নির্দেশ করা যায় না, কারণ এই পরিবারে কাজী নাম ধারী তিনজনের নামে এবং শাহ আবদুল ওহাবের সদর-ই-জাহান উপাধিতে মনে হয়, তাঁরা বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন অর্থাৎ তাঁরাও রাজ্য শাসনে অংশ গ্রহণ করতেন। শাহ আহমদ সম্বন্ধেও 'ধবল গজেন্দ্র সেবে বুলি যাহাকে বাখানে' উল্লেখিত আছে। ধবল গজেন্দ্র আরাকানী মঘ রাজাদের বুঝায়, সুতরাং মনে হয় শাহ আহমদ ও আরাকান রাজের অধীনস্থ কর্মচারী ছিলেন। চতুর্থত শরীফ সাহেব তাঁর তালিকায় মাহি আসোয়ার এর আনুমানিক তারিখ এবং হামজা খান, নসরত খান ও জলাল খানের মৃত্যু তারিখ নির্দেশ করেছেন। বলা বাহুল্য ঐ সব তারিখ মোহাম্মদ খানের বিবরণের কোথাও নাই।

মোহাম্মদ খানের বিবরণ অনুসারে মাহি আসোয়ার আরব দেশের সিদ্দিক [হজরত আবু বকর সিদ্দিক?] বংশে জন্মলাভ করেন; তিনি চারি আসহাবের গুণাবলী অর্জন করেন এবং 'শিক্ষাগুরু,' 'কল্পতরু' এবং 'অস্ত্রশস্ত্র গুরু' ছিলেন। হাজী খলিল পীরের 'আরবার' বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা হইলে তিনি মাহি আসোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। হাজী খলিল পীর 'সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ' এবং এক মৎস্য তাঁদের জন্য পিঠ পেতে দিলেন। অতঃপর ঐ 'মৎস্যের পৃষ্ঠেতে চড়ি' 'ভেলা' ভাসিয়ে তাঁরা চট্টগ্রামে পৌঁছেন।

এখানে কবির অতিরঞ্জন বাদ দিলে সাদামাঠা কথায় এই দাঁড়ায় যে মাহি আসোয়ার আরব দেশীয় একজন গুণসম্পন্ন লোক ছিলেন; তিনি এবং

হাজী খলিল পীর এক সঙ্গে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামে আসেন। হাজী খলিল পীরের 'সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ' বোধ হয় কোন এক রকম বিশিষ্ট পোষাককে সূচিত করে এবং 'মৎস্য পৃষ্ঠে আরোহণ' কোন বিশিষ্ট জাহাজকে নির্দেশ করে। এই দুই অলৌকিকতার নিদর্শন যে কবির কল্পনা প্রসূত, তাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ একই স্থানে কবি 'চলি ভেলা মাহি আসোয়ার'ও বলেছেন। হাজী খলিল পীরের 'আরবার' পৃথিবী ভ্রমণের ইচ্ছা, তাঁর একাধিকবার সমুদ্র ভ্রমণকে নির্দেশ করে। 'সিংহ চর্মে কৈলা আরোহণ' ও মৎস্য পৃষ্ঠে চড়া ব্যতীত কবির বর্ণনায় মাহি আসোয়ার ও হাজী খলিল পীরের পীরত্বের আর কোন বিবরণ নাই। আগেই বলা হয়েছে যে এই উক্তিগুলি কবির কল্পনা প্রসূত। কবি যেখানে বার আউলিয়ার উল্লেখ করেছেন, সেখানেও মাহি আসোয়ার বা হাজী খলিল পীরের নাম নাই। এতদ্দৃষ্টে মনে হয়, দুই জনেই তৎকালীন আরবীয় মুসলমানদের মত বাণিজ্যব্যপদেশে বা ভাগ্য অন্বেষণে চট্টগ্রামে আগমন করেন। মাহি আসোয়ার-এর প্রকৃত নামও জানা যায় না[১], মাহি আসোয়ার শব্দের অর্থ মৎস্যারোহী, ভাবার্থ বোধ হয় বিদেশী জাহাজী।

মাহি আসোয়ার ও হাজী খলিল পীর চট্টগ্রামে পৌঁছলে কদল খান গাজী ও বদর আলম তাঁদের অভ্যর্থনা করেন। এই দুই জন লোকের নামের উপর আধুনিক পণ্ডিতেরা বিশেষ তাৎপর্য আরোপ করেন। কেহ কেহ কদল খান গাজীকে সুলতান ফখর উদ-দীন মোবারক শাহের চট্টগ্রাম বিজয়ী সেনাপতি মনে করেন এবং বদর আলমকে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পীর বদর উদ-দীন বদর-ই-আলম-এর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন।[২] সপ্তদশ শতকের ঐতিহাসিক শিহাব-উদ-দীন তালিশের মতে সুলতান ফখর উদ-দীন মোবারক শাহ সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন ও মুসলমান শাসনাধীনে আনয়ন করেন।[৩] অন্য দিকে মোহাম্মদ খানের মাতৃকুল বর্ণনায় কদল খান গাজী পীরের উল্লেখ আছে, যিনি শত্রু নিধন করে চট্টগ্রামে একেশ্বরবাদ অর্থাৎ ইসলাম প্রচার করেন। সুতরাং আধুনিক গবেষকেরা নির্বিঘ্নে কদল খান গাজীকে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের সমসাময়িক জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেন যে জনশ্রুতিও তাঁদের মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।[৪] কিন্তু কদল খান গাজী যে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের

চট্টগ্রাম বিজয়ী সেনাপতি ছিলেন, তার কোন প্রমাণ নাই। মোহাম্মদ খানের বর্ণনা মতে কদল খান গাজী চট্টগ্রামে আগত বার জন আউলিয়াদের অন্যতম, এমন কি তাঁদের নেতা ছিলেন। অর্থাৎ মোহাম্মদ খানের মতে তিনি মুখ্যত পীর ছিলেন, শুধু ধর্ম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, অর্থাৎ যুদ্ধ করা তাঁর গৌণ উদ্দেশ্য। পীর দরবেশদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা বা যোদ্ধারা পরে জন সমক্ষে পীর দরবেশে রূপান্তরিত হওয়ার নজীর বাংলা দেশের ইতিহাসে বিরল নয়[৫], কিন্তু কদল খান গাজীকে সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের চট্টগ্রাম বিজয়ী সেনাপতি রূপে গ্রহণ করার পক্ষে কোন প্রমাণ এপর্যন্ত পণ্ডিতদের হস্তগত হয়নি। ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের সময়ে বাংলা দেশে আগত ইব্‌ন বতুতা সাদকাওয়ান-এ (যাকে চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়[৬]) ফখর-উদ-দীনের নিযুক্ত শাসন কর্তা হিসাবে শয়দা নামক একজন ফকির-এর নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি কদল খান গাজীর কোন উল্লেখ করেননি। এমতাবস্থায় কোন প্রমাণ্য সূত্রে সমর্থন না থাকলে জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে কোন ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করা অযৌক্তিক।

ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের সমসায়িক হিসাবে একজন কদর খানের নাম পাওয়া যায়। তিনি দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের অধীনে লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু এই কদর খান কদল খান গাজীর সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেনা, কারণ কদর খান ফখর-উদ-দীনের শত্রুছিলেন এবং ফখর-উদ-দীনের প্ররোচনায় সৈন্যদের হাতে নিহত হন। দ্বিতীয়ত কদর খান যখন লখনৌতির শাসনকর্তা ছিলেন তখন সোনারগাঁও-এ প্রথমে বাহরাম খান নামক সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের আর এক সেনাপতি শাসন কার্য পরিচালনা করতেন এবং পরে (বাহরমের মৃত্যুর পর) ফখর-উদ-দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৭] আবার কেউ কেউ হাজী খলিল পীরকে সিলেটের সুপ্রসিদ্ধ শাহ জালাল-এর সমসাময়িক মনে করেন। দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন ''হাজী খলিলের সমাধি শ্রীহট্টে বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ তিনি চট্টগ্রামে থাকিয়া যান নাই।''[৮] হাজী খলিল পীরের সমাধি সিলেটে থাকতে পারে, কিন্তু তিনি যে শাহ জালালের সমসাময়িক, এর কোন

প্রমাণ নাই। হাজী খলিল পীর একশত বৎসর পরেও শাহ জালালের দরগাহ যেয়ারত করতে যেতে পারেন এবং সেখানে ইন্তেকাল করতে পারেন। হাজী খলিল পীর যে চট্টগ্রামের বারজন আউলিয়াদের অন্যতম ছিলেন, এমন কোন কথা মোহাম্মদ খানের বিবরণে পাওয়া যায় না।

কদল খান গাজী ও মাহি আসোয়ারকে সুলতান ফখর -উদ-দীন মোবারক শাহের সমসাময়িক মনে করার বিপক্ষে আরও যুক্তি আছে। মোহাম্মদ খানের মতে মাহি আসোয়ার এবং দুই পুরুষ পরের রাস্তি খান চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা এই রাস্তি খানকে সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের সময়কালীন চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি বর্ণিত রাস্তি খানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। এই শিলালিপি ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল এবং এখানে রাস্তি খানকে 'মজলিস-ই- আলা' উপাধি দেওয়া হয়েছে।[৯] এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি এই যে দুই সূত্র মতেই রাস্তি খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। নামের সামঞ্জস্য এই সিদ্ধান্তের মূল ভিত্তি হলেও, মনে হয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য। প্রায় একই সময়ে, একই স্থানে একই নামের দুইজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও এর সম্ভাবনা কম। সুতরাং এই কারণে (অন্যকারণ পরে বলা হবে) এই দুই সূত্রের রাস্তি খান এক ও অভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু তাই যদি হয়, মোহাম্মদ খান বর্ণিত রাস্তি খানের সময় ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দ বা তৎনিকটবর্তী সময়ে নির্দেশিত হয়। অন্যপক্ষে, রাস্তিখানের সময় ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে ধরিলে, মাহি আসোয়ার বা তাঁর সমসাময়িক কদল খান গাজীর সময় পনর শতকের প্রথমার্ধের পূর্বে নির্দেশ করা যায় না। আধুনিক পণ্ডিতেরা মাত্র দুই পুরুষের ব্যবধানের জন্য প্রায় দেড়শত বৎসর ধার্য করেছেন যা নিতান্তই অযৌক্তিক। সুতরাং হয় দুই রাস্তিখান এক ও অভিন্ন নয়, অথবা মাহি আসোয়ার ও কদল খান গাজী সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের সমসাময়িক নয়, অথবা মোহাম্মদ খানের বর্ণিত বংশ-লতিকা ভুল। আধুনিক পণ্ডিতেরা এদিকে লক্ষ্য না রেখে একই সঙ্গে তিনটি সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। আহমদ শরীফ সাহেব এক জায়গায় বলেছেন, "কবি তাঁর পূর্ব-পুরুষদের কাহিনী বর্ণনায় কোন

ইতিহাসের সাহায্য পাননি। পিতৃপুরুষের মুখে-শোনা 'অতিরঞ্জিত আর সত্য ও কল্পনায় বিকৃত ইতিকথাই তিনি বর্ণনা করেছেন।"[১০] এতে মনে হয় শরীফ সাহেব মোহাম্মদ খানের বিবরণের প্রামাণ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নন, কিন্তু ব্যাপক ভাবে অনুসন্ধান না করেই একটু পরে তাঁর উত্থিত সংজ্ঞার সুর হারিয়ে ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহ, কদল খান গাজী ও মাহি আসোয়ারকে সমসাময়িক জানিয়ে দিয়েছেন। মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু নিম্নের আলোচনায় বুঝা যাবে যে কবির বংশ-লতিকা খানি নির্ভুল।

মোহাম্মদ খান এক বদর আলামকেও মাহি আসোয়ার-এর সমসাময়িক বলেছেন। সকল আধুনিক পণ্ডিতই এই বদর আলামকে সুপ্রসিদ্ধ পীর বদর-উ-দীন বদর-ই-আলম-এর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, যিনি ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন এবং বিহারের ছোট দরগায় সমাধিস্থ আছেন। শরীফ সাহেব পীর বদর-উদ-দীনের মৃত্যু তারিখ ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দে নির্ধারণ করেছেন। এর স্বপক্ষে তাঁর কি যুক্তি আছে, তিনি তার উল্লেখ করেননি। কিন্তু প্রায় পণ্ডিতই ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে পীর বদর-উদ-দীন-এর মৃত্যু তারিখ নির্ধারণ করেন।[১১] সুতরাং পীর বদর-উদ-দীনের জীবদ্দশায় আগত মাহি আসোয়ার-এর সময় পনর শতকের প্রথমার্ধের আগে নিরূপণ করা যায় না। এই তারিখ গ্রহণ করিলে মাহি আসোয়ার-এর দুই পুরুষ পরের রাস্তি খানের সময় ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে বা নিকটবর্তী সময়ে নির্ধারণ করা অযৌক্তিক নয়। এই কারণেই দুই রাস্তিখানকে অভিন্ন মনে করাও অযৌক্তিক নয় এবং এই কারণেই মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকাও নির্ভুল বলে মনে হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় মনে হয়, আধুনিক গবেষকেরা মাহি আসোয়ার-এর সময় প্রায় অর্ধশতাব্দীরও বেশী কাল এগিয়ে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য আমাদের উপরোক্ত সময় (পনর শতকের প্রথমার্ধ) গৃহীত হলে মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুতেই কমবে না। কদল খান গাজীকে প্রথম চট্টগ্রাম বিজেতা না ধরলেও চট্টগ্রামের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকার অসারতা প্রতিপন্ন হবে না। বোধ হয়, মোহাম্মদ খানের বর্ণনার প্রথম অংশের ঐতিহাসিক মূল্য এই যে, এতে চট্টগ্রামে মুসলমান বণিক ও পীর দরবেশদের আগমনের

এক অধ্যায় বর্ণিত হয়েছে। সুলতান ফখর-উদ-দীন মোবারক শাহের চট্টগ্রাম বিজয়ের পর মুসলমান বণিক ও সাধু পুরুষরা চট্টগ্রামে আসিতে থাকে, ইহা তারই একটি বড় প্রমাণ। অবশ্য চট্টগ্রামের সাথে আরবীয় মুসলমান বণিকদের যোগাযোগ যে খ্রীষ্টীয় নবম[১২] দশম শতাব্দী থেকে ছিল, তা আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ থেকেই জানা যায়,[১৩] কিন্তু বেশী সংখ্যক সাধু পুরুষদের আগমনের প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। ইব্‌ন বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্তেও পাওয়া যায় যে চট্টগ্রামে অনেক মুসলমান সাধু পুরুষ বাস করিতেন। বহুল প্রচারিত কিংবদন্তী মতে চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার দেশ। মোহাম্মদ খানের বর্ণনায় মনে হয়, এই কিংবদন্তী মোহাম্মদ খানের সময়েও অর্থাৎ সতর শতকের মাঝামাঝি সময়েও প্রচলিত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত মোহাম্মদ খান "পুস্তক বাড়এ হেতু" বার আউলিয়ার নাম প্রকাশ করেন নি (তিনি সকলের নাম জানতেন কিনা, তাও রীতিমত সন্দেহের ব্যাপার) নতুবা আধুনিক কালে বার আউলিয়ার নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে যা জল্পনা কল্পনা চলেছে তা অনেকটা নিরসন করা যেত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে অন্যান্য গবেষকদের মত, বর্তমান আলোচনাও দুইটি 'যদি' এর উপর নির্ভরশীল — যদি দুই রাস্তিখান এক ও অভিন্ন হয় এবং যদি মোহাম্মদ খান বর্ণিত বদর আলাম পীর বদর-উদ-দীন বদর-ই-আলমের সঙ্গে অভিন্ন হয়, — প্রামাণ্য সূত্রের অভাব থাকা পর্যন্ত এই 'যদি' গুলি থেকে যাবে, তবে হয়ত আরও প্রামাণ্য সূত্র আবিষ্কার হওয়া পর্যন্ত বর্তমান আলোচনা গবেষকদের চিন্তার খোরাক যোগাতে পারবে।

। মোহাম্মদ খানের বংশের ভূমিকা ।

মাহি আসোয়ার-এর সময় নিরূপণ করা যেমন কঠিন, চট্টগ্রামের ইতিহাসে মোহাম্মদ খানের বংশের ভূমিকা নির্ণয় করা তেমনি কষ্টকর। মোহাম্মদ খান তাঁর পিতৃকুল পরিচয়ে রাস্তি খানকে 'চাটিগ্রাম দেশপতি,' হামজা খানকে 'জিনিয়া ত্রিপুরাগণ' ও 'হেলায় পাঠানগণ জিনি,' নসরত খানকে 'প্রজার পালক' ও 'বাহুবলে শাসিলেন্ত ক্ষিতি' ও জলাল খানকে 'চাটিগ্রাম দেশকান্ত' আখ্যা দিয়েছেন।[১৪] মাতৃকুল পরিচয়ে তিনি শাহ আবদুল ওহাবের শ্বশুর

হিসাবে নসরত খানকে 'চাটিগ্রাম পতি' আখ্যা দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় কবির এই চারজন পূর্বপুরুষ চট্টগ্রামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। কবি তাঁর অন্যান্য পূর্ব-পুরুষ মিনা খান, গাভুর খান, বিরহিম খান ও মুবারিজ খানেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন, কিন্তু এই সব প্রশংসায় কোন রাজনৈতিক ভূমিকার সন্ধান মিলে না। এমন কি গাভুর খান সম্বন্ধে 'যার কীর্তি গৌড়দেশ ভরি' উক্তিতেও কোন রাজনৈতিক ভূমিকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয় না, কারণ সংশ্লিষ্ট শ্লোকে 'জ্ঞানে গুরু' ও 'দানে কল্পতরু' ছাড়া আর কোন কিছুর উল্লেখ নাই। গাভুর খান হয়ত জ্ঞানী ও দাতা ছিলেন এবং এই দুই গুণের জন্য কবির কল্পনাতে তিনি সমগ্র গৌড় দেশে (বাংলা দেশে) কীর্তিমান ছিলেন। অতঃপর কবির যেই চারজন পূর্ব-পুরুষ সম্পর্কে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, তাঁদের বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

আগেই বলা হয়েছে যে কবি বর্ণিত রাস্তি খান ও সুলতান রুকন-উদ-দীন বারবক শাহের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপি-বর্ণিত রাস্তি খান এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। শিলালিপিতে তাঁকে মজলিশ-ই-আলা উপাধি দেওয়া হয়েছে এবং মোহাম্মদ খান তাঁকে 'চাটিগ্রাম দেশপতি' বলেছেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের শিলালিপি পাঠে মনে হয় যে 'মজলিশ-ই-আলা' বা এর সমগোত্রীয় (যেমন মজলিশ-আল-মজলিশ, মজলিশ নুর ইত্যাদি) উপাধিগুলি সম্মান সূচক এবং উচ্চ রাজকর্মচারীবৃন্দকে (যেমন সেনাপতি, উজীর ইত্যাদি) বিতরণ করা হত।[১৫] সুতরাং মনে হয় রাস্তি খান উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন যদিও ঠিক কোন পদের অধিকারী ছিলেন তা সঠিক বলা যায় না। মোহাম্মদ খানের 'চাটিগ্রাম দেশপতি'কে সমর্থন সূচক সূত্র ধরিলে মনে হয় রাস্তি খান চট্টগ্রামের শাসন কর্তা (বা গভর্ণর) ছিলেন। রাস্তি খান সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। কিন্তু তাঁর পুত্র ও পৌত্র মিনা খান ও গাভুর খানকে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের অবধি নাই। কারণ, একদিকে পরাগলী মহাভারত ও ছুটী খানী মহাভারত মতে পরাগল খান[১৬] ও ছুটী খান (নসরত খান) যথাক্রমে রাস্তি খানের পুত্র ও পৌত্র ছিলেন এবং অপর দিকে মোহাম্মদ

খানের মতে মিনা খান ও গাভুর খান যথাক্রমে রাস্তি খানের পুত্র ও পৌত্র ছিলেন। ডঃ আহমদ হাসান দানী বিনা দ্বিধায় মিনা খান ও গাভুর খানকে যথাক্রমে পরাগল খান ও ছুটী খানের সহিত অভিন্ন মনে করেন।[১৬] বলা বাহুল্য কোন প্রমাণ না থাকায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। পরাগল খান ও ছুটী খান সম্বন্ধে পরাগলী ও ছুটী খানী মহাভারতে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়।

পরাগল খান ঃ

নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি॥[১৭]

ছুটী খান ঃ

নসরত সাহা তাত অতি মহারাজা।
রাম বহুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহা যে অ ক্ষিতি পতি।
সামদান দণ্ড ভেদে পালএ বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটীখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্বত কন্দরে॥
চারু লোল গিরি তার পৈতৃক বসতি।...
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব দিকে মহাগিরি পার নাহি তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটী খান মহাশয়॥ ...

তাহান যত গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতুহল মতি ॥
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটী খান ॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী ॥[১৮]

এসব উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করে আধুনিক পণ্ডিতেরা পরাগল খান ও ছুটী খানকে হোসাইন শাহী আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা (বা গভর্ণর) মনে করেন।[১৯] কিন্তু লক্ষণীয় যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী তাঁদের নামের সঙ্গে শুধু 'লস্কর' শব্দ (বা উপাধি) ব্যবহার করেছেন। কোন কোন স্থানে 'নৃপতি', 'সেনাপতি' এবং 'পালে বসুমতী' উল্লেখ করা হয়েছে। 'নৃপতি' ও 'পালে বসুমতী' যে নিছক কবির কল্পনা প্রসূত তাতে কোন সন্দেহ নাই। এমন কি তাঁরা সেনাপতি ছিলেন কি না তাও সন্দেহের অতীত নয়। বাংলা সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন সূত্রে পরাগল খান বা ছুটী খানের নাম পাওয়া যায় না। নেহায়েত বাংলা ভাষার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন বলে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী তাঁদের পৃষ্ঠ-পোষকদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং মধ্য যুগের সকল কবিদের ন্যায় অতি রঞ্জন করেছেন। 'লস্কর' প্রশংসার আতিশয্য হেতু, তাঁদের লেখনীতে সেনাপতি ও কোন কোন স্থানে নৃপতি আখ্যা পেয়েছেন বলে সন্দেহ করা অমূলক নয়। বাংলা ভাষার আদর না করলে তাঁদের নাম আদৌ আমাদের নিকট পৌঁছাত কিনা সন্দেহ। আমাদের মনে হয় পরাগল খান ও ছুটী খান রাস্তি খানের পুত্র ও পৌত্র ছিলেন এবং দুই জনেই হোসাইন শাহী আমলে সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন।

পক্ষান্তরে মিনা খান ও গাভুর খানও রাস্তি খানের পুত্র ও পৌত্র ছিলেন। মিনা খান সম্পর্কে কবির উক্তি 'রণে যেন ভৃগুপতি সম' এবং গাভুর খান সম্পর্কে উক্তি 'ভীমসম বলবান' দৃষ্টে মনে হয় তাঁরাও হয়ত সৈন্য বিভাগে কাজ করেন, তবে কোন উচ্চ পদের অধিকারী ছিলেন না। বলা বাহুল্য এই মত গ্রহণ করলে মোহাম্মদ খান বা কবীন্দ্র পরমেশ্বর কারও

উক্তির সত্যতায় সন্দেহ করা যায় না, কারণ রাস্তি খানের দুই পুত্র থাকা অসমীচীন নয়। কিন্তু এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত পরাগল খান ও ছুটী খান যদি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা (বা গভর্ণর) না ছিলেন, তা হলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা কে ছিল? উত্তরে বলতে হয় যে এই প্রশ্নের মীমাংসা কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা মোহাম্মদ খানের কাছে পাওয়ার আশা করা অযৌক্তিক। তাঁরা কেউ চট্টগ্রামের ইতিহাস লিখেন নি। কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী শুধু তাঁদের পৃষ্টপোষকদের গুণ কীর্তন করেছেন এবং মোহাম্মদ খান শুধু তাঁর পূর্ব পুরুষদের প্রশংসা করেছেন। দ্বিতীয়ত মোহাম্মদ খান তাঁর বংশ-লতিকায় পরাগল খান ও ছুটী খানের নাম উল্লেখ করেননি কেন? প্রশ্নটি আপাতঃ দৃষ্টিতে জটিল, কিন্তু পূর্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এর সমাধান বড় সহজ। আমাদের অনুমান যদি ঠিক হয় যে পরাগল খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন না, বরং চট্টগ্রামের এক কোণায় অবস্থিত সামান্য একটি থানার অধিকারী ছিলেন, তাহলে বলতে হবে তারা এমন কোন 'সুপ্রসিদ্ধ' পুরুষ ছিলেন না। এমতাবস্থায় কবির ছয় পুরুষ আগের বংশের বিভক্ত একটি শাখার বংশ-লতিকা বর্ণনা করা সহজও নয় সমীচীনও নয়। মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় দেখা যায় যে প্রথম থেকে নবম পুরুষ পর্যন্ত তাঁর বংশ একই ধারায় চলে আসছে। কিন্তু সত্যিই কি তাঁর বংশ শুধু এক ধারায় চলে আসছিল? তার কি শাখা প্রশাখা বিস্তার হয়নি? প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার মত কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু বংশের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মাতৃকুল ও পিতৃকুল উভয়ের সকল শাখা প্রশাখার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে হয়ত মোহাম্মদ খানের বই লেখাই হত না। "পুস্তক বাড়এ হেতু" তিনি বার আউলিয়ার নামগুলি পর্যন্ত দেননি। পরাগল খান ও ছুটী খানকে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মনে করে, আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন যে মোহাম্মদ খানের বিবরণ থেকে বংশের এই দুইজন সুপ্রসিদ্ধ লোক বাদ পড়ে যাওয়া অদ্ভুত মনে হয়।[২০] কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে পরাগল খান বা ছুটী খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন না। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি বলাও যায় যে তাঁরা চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন, তা হলেও কবির আপন বংশ ধারায় গৌরব করার মত

শাসনকর্তা কম ছিলনা, যেমন হামজা খান, নসরত খান ও জলাল খান। সুতরাং ছয় পুরুষ আগে বিভক্ত অন্য শাখায় দুইজন লোককে (তাঁরা শাসনকর্তা হলেও) বাদ দিলেও কবির নিজের বংশ গৌরব অক্ষুন্ন থাকে। তবে বলা যায়, বংশের বিভক্ত শাখার পূর্ব-পুরুষ হিসাবে উল্লেখ না করলেও কবিদের পৃষ্ঠ-পোষক হিসাবে মোহাম্মদ খান পরাগলী মহাভারত ও ছুটী খানী মহাভারত দেখেছিলেন কিনা তার কোন প্রমাণ নাই। মোহাম্মদ খানের গুরু সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থে পরাগলী মহাভারতের উল্লেখ আছে।[২১] এতে মনে হয়, পরাগলী মহাভারতের সঙ্গে মোহাম্মদ খানের চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলেও তিনি এই পুঁথির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কিন্তু মাহি আসোয়ার-এর বংশ ধারার পরাগলী শাখা ও মোহাম্মদ খানী শাখার নিবাস ও অনেক ব্যবধান ছিল। পরাগলী শাখার নিবাস ছিল বর্তমান ফেণী নদীর তীরে পরাগলপুর আর মোহাম্মদ খানী শাখার নিবাস দক্ষিণ চট্টগ্রামে (বর্তমান পটীয়া থানায়) ছিল বলেই মনে হয়। এই ব্যবধান দুই শাখার মধ্যে যোগাযোগ রাখায় সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি না করলেও দ্রুত যানবাহনের অভাবে যোগাযোগ রাখা দুঃসাধ্য ছিল। সুতরাং মোহাম্মদ খান বংশের এই বিভক্ত শাখা সম্বন্ধে জানতেন কিনা তাও সন্দেহজনক।

সৈন্য বিভাগে পরাগল খান ও ছুটী খানের পদমর্যাদা কি ছিল তা সম্যক জানা যায় না, কিন্তু 'লস্কর' শব্দটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে এর হদিশ মিলবে মনে হয়। লস্কর শব্দের অর্থ সৈন্য। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের শিলালিপিতে সর-ই-লস্কর উপাধি বিশিষ্ট অনেক কর্ম-কর্তার নাম পাওয়া যায়।[২২] সর-ই-লস্কর শব্দের অর্থ সৈন্যদের নেতা বা সেনাপতি। সুতরাং শুধু আক্ষরিক অর্থ মেনে নিলে বলতে হয় পরাগল খান ও ছুটী খান দুজনেই সামান্য সৈনিক ছিলেন, সেনাপতি বা নৃপতি ছিলেন শুধু কবিদের কল্পনায়। বলা যেতে পারে যে ছন্দের মিল রাখার জন্য কবি 'সর-ই-লস্কর' এর প্রথম অংশ (সর) বাদ দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় অংশই (লস্কর) শুধু উল্লেখ করেছেন। এই অনুমান সত্য হলেও বলতে হবে পরাগল খান ও ছুটী খান সর-ই-লস্কর (সেনাপতি) ছিলেন। সুতরাং এখানে সর-ই-লস্করের যথার্থ পদমর্যাদা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

সমসাময়িক শিলালিপিতে উজীর, জিলা (আরছা বা ইক্‌লীম) কর্তৃপক্ষ এবং থানাদার সবাই সর-ই লস্কর হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে।[২৩] সুতরাং শুধু সর-ই-লস্কর শব্দে তাদের প্রকৃত পদমর্যাদা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে মনে হয় ছুটী খানী মহাভারতের উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশে এ বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উদ্ধৃত অংশে মনে হয় 'চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে,' 'চন্দ্রশেখর পর্বত কন্দরে' 'ফনী নদী বেষ্টিত' স্থানে পরাগল খান ও ছুটী খানের আবাসস্থান ছিল। সুলতানদের নিকট থেকে ঘোটক ইত্যাদি উপহার পান এবং 'লস্করী বিষয় পাইয়া' 'সাম দান দণ্ড ভেদে' বসুমতী পালন করেন। 'লস্করী বিষয়' থেকে মনে হয় তাঁরা সৈন্য পরিচালনা সংক্রান্ত কোন কাজের ভার পান। কিন্তু এই কাজ যদি চট্টগ্রাম-এর শাসন সংশ্লিষ্ট হত, তাহলে 'চাটিগ্রাম দেশপতি' বা তদনুরূপ কোন বর্ণনা স্থান পেত। আবার তাঁরা যে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হন নি তার প্রমাণ এই যে শ্রীরাজ মালায় পরাগল খান বা ছুটী খানের কোন নাম পাওয়া যায় না। অন্য পক্ষে চন্দ্রশেখর পর্বত ও ফেণী নদীর দ্বারা বেষ্টিত স্থান চিহ্নিত করায় মনে হয়, ঐ স্থানে সৈন্যদের একটি থানা স্থাপন করা হয়েছিল এবং পরাগল খান ও ছুটী খানকে ঐ থানারই অধিপতি নিযুক্ত করা হয়েছিল। শত্রু রাজ্য ত্রিপুরা সীমান্তে থানা স্থাপন করা অসমীচীন নয়, বরং এইরূপ থানা যে রাজ্যের সকল সীমান্তে ছিল, তার নযীর ইতিহাসে বিরল নয়। সুতরাং মনে হয় পরাগল খান ও ছুটী খান, হোসাইন শাহী আমলে এই থানার অধিপতি বা এই থানায় নিযুক্ত সৈন্যদের নেতা ছিলেন। ঐ এলাকায় অবস্থিত পরাগল পুর এখনও পরাগল খানের নাম বহন করে এবং মনে হয় এই পরাগলপুরেই থানাটি অবস্থিত ছিল। আমাদের এই অনুমান 'চাটিগ্রামে চলি আইল হরষিত হৈয়া' পদের বিরোধী নয়। কারণ হোসাইন শাহী আমলে ফেণী নদীই চট্টগ্রামের পশ্চিম সীমান্তে ছিল।

গাভুর খানের পুত্র হামজা খান মছলন্দ। এ পর্যন্ত কোন পণ্ডিত মছলন্দ শব্দটির ব্যাখ্যা করেন নি এবং সেইজন্য চট্টগ্রামের ইতিহাসে হামজা খানের সঠিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন নি। মনে হয় 'মছলন্দ' শব্দটি একটি

উপাধি এবং ইহা মছনদ-ই-আলা-এর বিকৃত লিপি। হামজা খানকে ত্রিপুরা ও পাঠান বিজেতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় হামজা খানকে মছনদ-ই-আলা উপাধি কে দেন, ত্রিপুরা ও পাঠান বিজেতার তাৎপর্য কি এবং কোন সময়েই বা তিনি ত্রিপুরা ও পাঠান বিজয় করেন? এই প্রশ্নগুলির জবাব এক সঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। রাস্তি খান, পরাগল খান ও ছুটী খানের সময় তুলনা করলে অথবা রাস্তি খানের দুই পুরুষ পরের সময় হিসাব করলে দেখা যায়, হামজা খান বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াস-উ-দীন মাহমুদ শাহ এবং শের শাহের সমসাময়িক ছিলেন। এই দুই জন সুলতানের নিকট থেকেই হামজা খানের মছনদ-ই-আলা উপাধি পাওয়া সম্ভব। বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে ও দিল্লীর সুর বংশীয় সুলতানদের আমলে মছনদ-ই-আলা, মজলিশ-ই-আলা, মজলিশ-আল-মজলিশ ও হযরত-ই-আলা ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত রাজ কর্মচারীদের নাম সমসাময়িক সূত্রে পাওয়া যায়।[২০] যেহেতু হামজা খানকে পাঠান বিজেতা বলা হয়েছে, মনে হয় সুর বংশীয় সুলতানদের (তাঁরাও পাঠান ছিলেন) সাথে তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং মনে হয়, হামজা খান হোসাইন শাহী সুলতানদের নিকট থেকে এই উপাধি লাভ করেন। এ শুধু আমাদের অনুমান নয়, এর সপক্ষে প্রমাণ আছে। সমসাময়িক পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বিবরণে পাওয়া যায় যে শের শাহের বাংলা দেশ জয়ের প্রাক্কালে চট্টগ্রামে আমিরজা খান ও খোদাবখস খান নামক সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের দুই জন সেনাপতি ছিলেন।[২১] পর্তুগীজ বিবরণের আমিরজা খান ও মোহাম্মদ খান বর্ণিত হামজা খান এক ও অভিন্ন; স্থান ও কাল উভয় দিকে বিবেচনা করলে এই অভিন্নতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হামজা খানের ত্রিপুরা জয় ও পাঠান জয়ের ব্যাখ্যা সহজ হয়ে পড়ে। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদের সেনাপতি হিসাবে সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। পাঠান বিজয় নিশ্চয়ই শের শাহ সুরকেই বুঝায়। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ ও শের শাহের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ

পরাজিত হন এবং শের শাহ জয়লাভ করে বাংলার অধীশ্বর হন। পর্তুগীজ বিবরণ মতে জানা যায় যে শের শাহ চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য তাঁর এক (সেনাপতি) পাঠান। হামজা খান শের শাহের ঐ সেনাপতির বিরুদ্ধাচরণ করে ও পর্তুগীজদের সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করে শের শাহের সেনাপতিকে পর্তুগীজ জাহাজে বন্দী করতে সমর্থ হয়।[২২] শের শাহ যেহেতু সুর বংশীয় পাঠান ছিলেন, হামজা সম্পর্কে মোহাম্মদ খানের পাঠান বিজেতা উক্তি ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন যে হামজা খানের [তাঁর মতে গাভুর খানের] প্রতিদ্বন্দ্বী পাঠান খোদা বখশ খানই হবে।[২৩] তাঁর এই মতের কারণ, হামজা খান ও খোদা বখশ খানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও লড়াই-এর বিবরণ পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের বিবরণে পাওয়া যায়।[২৪] কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মত গ্রহণ যোগ্য নয়। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হামজা খানের প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল তা নির্ণয় করা নয়। মোহাম্মদ খানের পাঠান বিজেতা উক্তির পাঠান বলতে কাকে নির্দেশ করে তা নির্ধারণ করা। খোদা বখশ খান পাঠান ছিলেন কি না জানা নাই। তিনি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ কর্তৃক নিযুক্ত পাঠান কর্মচারী হলেও (হোসাইন শাহী আমলে পাঠান কর্মচারী থাকা বিচিত্র নয়), খোদা বখশ খান সম্পর্কে "হেলায় পাঠানগণ জিনি" উক্তির প্রয়োগ অতিরঞ্জন দোষে দুষ্ট হবে। কারণ, খোদা বখশ খান পাঠান হলেও তিনি নিজে পাঠান ছিলেন, পাঠান রাজশক্তির ধারক ছিলেন না।

মোহাম্মদ খানের একটি শ্লোকে আছে ঃ

শত্রু সব করি ক্ষয়　　　বাহু বলে লভি জয়
বাপ হোন্তে কৈলা রাজধ্বনি [পাঠান্তরে রাজধানী]

ডঃ এনামুল হক ও মরহুম আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এই শ্লোকটি গাভুর খানের প্রতি আরোপ করে তাঁকে নব রাজধানী স্থাপয়িতা নির্দেশ করেছিলেন।[২৫] অধ্যাপক আহমদ শরীফও প্রথমে তাই মনে করতেন কিন্তু পরে যখন মত পালটিয়ে শ্লোকটি হামজা খানের প্রতি আরোপ করলেন,

তখন রাজধানী স্থাপনের বিষয়টা বাদ দিয়েছেন, সুতরাং তাঁর বর্তমান মতামত বুঝার উপায় নাই। মনে হয়, আলোচ্য শব্দটির পাঠ 'রাজধবনি' হবে, অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর হামজা খান রাজার ধ্বনি করেন, ভাবার্থে রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। আর যদি রাজধানী পাঠ মেনে নেওয়া হয়, তা হলে বলতে হবে, হামজা খান নিজে স্বাধীন রাজ্য গঠন করে নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। ত্রিপুরা ও পাঠান বিজেতা হামজা খানের পক্ষে রাজধানী স্থাপন করার বা স্বাধীন রাজ্য গঠন করার স্বপ্ন দেখা বোধ হয় অশোভন হতনা, কিন্তু চট্টগ্রামের অবস্থান, এবং বাংলার সুলতান, ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ — এই তিন শক্তির লোলুপ দৃষ্টিও তাঁদের চট্টগ্রাম অধিকারের ঘন ঘন প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মনে হয় হামজা খানের পক্ষে স্বাধীন রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা যেমন অদূরদর্শিতা তেমনি হাস্যাস্পদ হত। তবে ত্রিপুরা ও পাঠান জিনিবার পর হামজা খান কি ভূমিকা গ্রহণ করেন? এতদ্বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি, সুতরাং মন্তব্য করা অনুচিত। এইটুকু বলা যায় যে হামজা খান স্বাধীন রাজ্য গঠন করলেও তাঁর স্বাধীনতা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ ও পাঠানের শত্রু হামজা খানের পক্ষে আরাকান রাজের সঙ্গে মিতালী করা বা আরাকান রাজের আনুগত্য স্বীকার করার সম্ভাবনাই বেশী।

শরীফ সাহেব হামজা খানের মৃত্যুর তারিখ ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে নির্দেশ করেছেন। কি সূত্র অবলম্বনে তিনি এই তারিখ নির্ধারণ করেছেন, আমাদের জানা নাই। তবে হামজা খান যে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন তাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। হামজা খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নসরত খান পিতৃ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সমসাময়িক হিসাবে আরও কয়েকজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। তাঁর জামাতা সদর-ই-জাহান উপাধি ধারী শাহ আবদুল ওহাব, ঈশা খান মছনদ-ই-আলা ও দক্ষিণকূলের আদম সুধীর কর্তৃক সম্মানিত ছিলেন। ঈশা খান পূর্ব বাংলায় অনেক দিন কর্তৃত্ব করেছিলেন এবং মোঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করেন। আদম দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু চকরিয়া অঞ্চলে আরাকান রাজার অধীনে জমিদার

বা সামন্ত ছিলেন। শ্রীরাজমালা মতে আদম ত্রিপুরারাজ অমর মাণিক্যের (১৫৭৭ — ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন। সুতরাং নসরত খানের সময় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে নির্দেশ করা যায়।

শ্রীরাজমালা মতে ত্রিপুরারাজ অমর মানিক্যের সঙ্গে আরাকানরাজ মেঙ ফালঙ (সিকান্দর শাহ)-এর ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ চলা কালে ত্রিপুরারাজ ও আরাকানের রাজার মধ্যে নিম্নরূপ পত্রালাপ হয়ঃ

"মঘ রাজা সেকান্দর রসাঙ্গেতে গেল।
অমর মানিক্য স্থানে পত্রি যে লিখিল ॥
আদম সাহাকে রাজা পাঠাও ত্বরিত।
তবে তোমা সঙ্গে আমা হব বহু প্রীত ॥
সেকান্দর সাহা স্থানে নৃপে লিখে পুনি।
শরণাগত আদম সাহা না দিব কখনি ॥"[২৯]

সুতরাং ঈশা খান, আদম, অমর মাণিক্য, মেঙ ফালঙ (সিকান্দর শাহ), শাহ আবদুল ওহাব (সদর-ই-জাহান) ও নসরত খান যে সমসাময়িক এতে কোন সন্দেহ নাই। এঁদের মধ্যে অমর মাণিক্যের রাজত্ব কাল ১৫৭৭-১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ,[৩০] মেঙফালঙ-এর রাজত্ব কাল ১৫৭১-১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ[৩১] এবং ঈশা খান ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[৩২] সুতরাং নসরত খানের সময় ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের পরে নির্দেশ করা যায় না। এই সূত্রে নসরত খানের পুত্র জলাল খানের সময় ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের প্রথমে নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু জলাল খান সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি নূতন তথ্য পরিবেশন করেছেন। ছন্দমালা লস্করের আরাকান ইতিহাস (২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০) অবলম্বনে তিনি বলেন "উক্ত সংঘর্ষকালে [অমর মানিক্য ও মেঙফালঙ-এর যুদ্ধ] 'চাইতাগঙের উজী (র) জলা (ল)' ম্রুঙ রাজার (অর্থাৎ ত্রিপুরাধিপতির) পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরাজয় হইলে ভয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।"[৩২] আমরা ছন্দমালা লস্করের ইতিহাসের খোঁজ পাইনি, সুতরাং এই উক্তির সত্যতা যাচাই করতে অক্ষম। কিন্তু যদি দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের এই উক্তি সত্য হয়, তা হলে বলতে হবে জলাল খান ১৫৮৫-৮৬

খ্রীস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন, কারণ ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ ত্রিপুরারাজ অমর মাণিক্যেরও শেষ তারিখ। বলা বাহুল্য জলাল খানের এই মৃত্যু তারিখ গ্রহণ করা অযৌক্তিক নয়, শুধু মনে করে নিতে হবে যে পিতা-পিতামহদের তুলনায় নসরত খান ও জলাল খান অল্প বয়সে মারা যান।

উপরোক্ত আলোচনায় মনে হয়, মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকার দ্বিতীয় ভাগের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। যথাযথ ভাবে বিচার করলে এবং ব্যাপক ভিত্তিক গবেষণা চালালে ইহা চট্টগ্রামের ইতিহাসের এক অধ্যায় প্রণয়নে সাহায্য করবে। আপাতত আগামী দিনের গবেষকদের হাতে এই মহৎ কাজ ছেড়ে দেওয়া হল। তবে প্রবন্ধ শেষ করার আগে বিরহিম খান, মোবারিজ খান ও মোহাম্মদ খান সম্পর্কে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেন যে বিরহিম খান নামে মাত্র উজীর ছিলেন এবং কবি মোহাম্মদ খান ও চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত মুল্লুক শোয়াও গ্রামের মসজিদ নির্মাতা নায়েব উজীর মোহাম্মদ খান অভিন্ন ব্যক্তি।[৩৪] আহমদ শরীফ সাহেব এই মত সন্দেহ করেন।[৩৫] একমাত্র নামের সামঞ্জস্য ছাড়া এই মতের পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। কোন প্রমাণ সূত্র আবিষ্কৃত হওয়া পর্যন্ত বলতে হবে, আরাকান রাজের বিরুদ্ধে জলাল খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই হয়ত তাঁর পরবর্তীরা, যেমন বিরহিম খান, মোবারিজ খান ও মোহাম্মদ খান কোন রাজ পদ পাননি। বিরহিম খান উজীর থাকলে মোহাম্মদ খান নিশ্চয়ই তা লিপিবদ্ধ করতেন। মনে হয় লক্ষ্মী বিবর্জিত বংশ-উদ্ভূত মোহাম্মদ খানের প্রতি সরস্বতী দয়াপরবশ হন এবং তারই ফল মকতুল হোসাইন, সত্যকলি বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ আর মোহাম্মদ খান প্রণীত অন্যান্য কাব্য সমূহ।

॥ নির্দেশিকা ॥

১. উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক মৌলভী হামিদ উল্লাহ খানের মতে (তারিখ-ই-হামিদ, পৃঃ ১১০—১১১) মাহি আসোয়ার-এর প্রকৃত নাম বখতিয়ার এবং তিনি বখতিয়ার মাহি আসোয়ার নামে পরিচিত ছিলেন।

২. সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৬—১০৭ ;
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫৪ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৪।

৩. যদুনাথ সরকার : ষ্টাডিজ ইন মুঘল ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১২২।

৪. সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৬ ; এনামুল হক : পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, পৃঃ ২২।

৫. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন আঃ করিম :সোশ্যাল হিষ্টরি অব দি মুসলিমস অব বেঙ্গল, পৃঃ ১২৫—১২৬।

৬. এন. কে. ভট্টশালী : কয়নস্ এণ্ড ক্রনলজী অব দি আর্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট সুলতানস্ অব বেঙ্গল, পঃ ১৪৫—১৪৯।

৭. বিস্তৃত বিররণের জন্য দেখুন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হিষ্টরি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭—১০০

৮. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৪ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৫

৯. শমস্-উদ্-দীন আহমদ : ইন্‌স্‌ক্রিপশন্‌স অব বেঙ্গল, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৯১

১০. সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৫

১১. এতদ্বিষয়ে জার্ণ্যাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভলুম ৭, পার্ট ১, পৃঃ ৩৪—৩৫

১২. আরব ভৌগোলিকদের বিবরণের জন্য ইলিয়ট ও ডউসন : হিষ্ট অব ইণ্ডিয়া এজ টোল্ড বাই ইট্‌স অওন হিষ্টোরিয়ানস, ভল্যুম ১ দ্রষ্টব্য।

১৩. ইতিপূর্বে প্রায় সকল গবেষকই 'জিনিয়া ত্রিপুরাগণ' ও "হেলায় পাঠানগণ জিনি" গাভুর খানকে আরোপ করেছেন, কিন্তু সম্প্রতি শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় (বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর পৃঃ ৩২৪) দেখিয়েছেন যে এই উক্তিগুলি হামজা খানের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। শরীফ সাহব ইহা মেনে নিয়েছেন (সাহিত্য পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২১১) এবং আমরাও তাই সহজ মনে করি।

১৪. এ. এইচ. দানী : বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইনসক্রিপশন্‌স অব বেঙ্গল, টেবল নং ৩

১৫. হামিদুল্লাহ খানের মতে পরাগল খানের শুদ্ধ নাম পুর আকল খান। پرعقل শব্দের অর্থ বুদ্ধিমন্ত। তারিখ-ই-হামিদী, পৃঃ ৭১

১৬. প্রসিডিং অব দি পাকিস্তান হিষ্টরি কনফারেন্স, ভল্যুম ১, পৃঃ ২০১

১৭. দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ পৃঃ ৯৪

১৮. ছুটি খানের মহাভারত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত ও দীনেশচন্দ্র সেন ও বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ৩

১৯. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুনঃ আহমদ হাসান দানীঃ বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইনসক্রিপশন্‌স অব বেঙ্গল, পৃঃ ৯৪—১০২

২০. ঐ

২১. সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০৭—১০৮

২২. সৈয়দ সুলতান : ওফাতে রসুল, আলী আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ৮/০

২৩. এ, এইচ, দানী : বিব্লিওগ্রাফী অব দি মুসলিম ইনসক্রিপসন্‌স অব বেঙ্গল, পৃঃ ৯৪—১০২

ইলিয়ট ও ডউসন : হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইট্স অওন হিষ্টরিয়ান্‌স,

২৪. ক্যামপস : হিষ্টরি অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৪২

২৫. ঐ

২৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৪শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃঃ ২৬। দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য 'হেলায় পাঠানগণ জিনি' উক্তিটা গাভুর খানের প্রতি আরোপ করেন।

২৭. ক্যামপস : হিষ্টরি অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, পৃঃ ৪২

২৮. আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃঃ ৭৪

২৯. শ্রীরাজমালা, ৩য় লহর, কালীপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ৪২

৩০. শ্রীরাজমালা, ৩য় লহর পৃঃ ২৪১

৩১. এ. পি, ফেয়ার : হিষ্টরি অব বার্মা, পৃঃ ১৭৩

৩২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হিষ্টরি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৩। অধ্যাপক আহমদ শরীফ ঈশা খানের মৃত্যু তারিখ ১৫৮৯ খ্রী: নির্ধারণ করেছেন (সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ: ১০৭) তিনি কি সূত্র অবলম্বন করেছেন, আমাদের জানা নাই।

৩৩. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৪ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃ: ৩০

৩৪. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৪ শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃ: ২৩, ৩০

৩৫. সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ: ১০৪